প্রথম আলো

কলাম

মতামত

এইচএসসি ফল বিপর্যয়: ব্যর্থতা নয়, জাগরণের বার্তা

লেখা: এ কে এম হুমায়ুন কবির

প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৫৩

এইচএসসি পরীক্ষায় ফল পেয়ে এভাবেই উচ্ছ্বসিত হন শিক্ষার্থীরা *প্রথম আলো ফাইল ছবি*

এ বছর বাংলাদেশে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর যেন এক নতুন ধাক্কা খেল পুরো জাতি। পাসের হার কমেছে, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় আশঙ্কাজনক হারে নেমে এসেছে। অভিভাবকদের চোখে হতাশা, শিক্ষার্থীদের মুখে নিরাশা। প্রশ্ন উঠছে, এটা কি কেবল একটি বছরের ‘ফলাফল বিপর্যয়?’ নাকি এটি সেই দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি, যা বহু বছর ধরে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর নীরবে জমে ছিল?

কেন এমন হলো? এ প্রশ্নের উত্তর শুধু এক বা দুটি কারণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার প্রতিফলন। এর মধ্যে অন্যতম হলো ক) কোভিড-পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি—দীর্ঘ দুই বছর স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শেখার ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়। অনলাইন ক্লাসে অনেকেই অংশ নেয়নি; যারা নিয়েছিল, তাদের শেখার গভীরতা ছিল কম। সেই শেখার ফাঁক এখন ফলাফলে প্রকটভাবে ধরা পড়েছে।

খ) প্রশ্ন ও মূল্যায়নের কঠোরতা: কয়েক বছর তুলনামূলক সহজ প্রশ্নে ভালো ফল আসছিল, কিন্তু এ বছর প্রশ্নপত্রের মান কিছুটা কঠোর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতার অভাব প্রকাশ পেয়েছে।

গ) মানসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব: দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। আবার যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই আউটকাম-বেজড এডুকেশন (ওবিই), দক্ষতাভিত্তিক পাঠদান বা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। ফলে পাঠদান এখনো ‘বই পড়ানো’ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

ঘ) মুখস্থনির্ভর ও কোচিং-নির্ভর শিক্ষা: বাংলাদেশে এখনো শেখার চেয়ে পরীক্ষার ফলই মুখ্য। কোচিং সেন্টার-নির্ভর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভাবনাশক্তি সীমিত করে ফেলেছে। যখন মুখস্থ ব্যর্থ হয়, তখন ফলাফলও মুখ থুবড়ে পড়ে।

ঙ) পরিবার ও সমাজের চাপ: অভিভাবকেরা সন্তানের ফলাফলকে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার প্রতীক বানিয়ে ফেলেছেন। এতে শিশুরা প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়ছে—শেখার আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে।

ফলাফলের এই পতন কেবল সংখ্যা নয়। এইচএসসির ফলাফল শুধু বার্ষিক পরিসংখ্যান নয়, এটি ভবিষ্যতের মানবসম্পদের মানের প্রতিফলন। এই পতনের প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে—

১. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসংকট: সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে।

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ: শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় আর্থিক সংকট দেখা দিচ্ছে।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহ হ্রাস: এতে গবেষণা, উদ্ভাবন ও শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪. বিদেশে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর দক্ষতা হ্রাস: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে।

এসব মিলিয়ে এটি কেবল শিক্ষাগত নয়; বরং জাতীয় উন্নয়নের জন্য এক গভীর সংকেত।

এর দায় কার? এই ব্যর্থতার দায় শুধু শিক্ষার্থীর নয়, দায় ভাগাভাগি করতে হবে সবাইকে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনাকে দায়সারা কাজ মনে করছে। শিক্ষকেরা অনেকেই এখনো প্রশিক্ষণ ও আধুনিক পদ্ধতির বাইরে রয়েছেন। অভিভাবকেরা শেখার চেয়ে ফলাফলে বেশি গুরুত্ব দেন। নীতিনির্ধারকেরা নীতি পরিবর্তন করলেও তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ। ফলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটিই আজ দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরণের পথ কোথায়? এমন কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন:

ক) শেখার পুনরুদ্ধার কর্মসূচি: কোভিড-পরবর্তী শেখার ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিটি স্কুল-কলেজে ব্রিজ কোর্স চালু করা উচিত। বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা শনাক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা দিতে হবে।

খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক পদ্ধতির প্রসার: প্রত্যেক শিক্ষককে আউটকাম-বেজড এডুকেশন, আইসিটিভিত্তিক পাঠদান এবং দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

গ) পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন: শুধু তথ্য মুখস্থ নয়; বোঝা, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগক্ষমতা যাচাই করতে হবে। প্রশ্নপত্রে সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বাড়ানো জরুরি।

ঘ) জীবনদক্ষতা ও নৈতিকতা শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ, ডিজিটাল দক্ষতা ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, যা কর্মজীবনে সফল হতে সহায়তা করবে।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে রেমিডিয়াল কোর্স চালু: প্রথম সেমিস্টারে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রিজ প্রোগ্রাম রাখা উচিত, যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় মানিয়ে নিতে পারে।

চ) মানসিক স্বাস্থ্য ও কাউন্সেলিং: ফলাফলজনিত মানসিক চাপ মোকাবিলায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং সেল থাকা জরুরি।

নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান—এখন সময় এসেছে সংখ্যাভিত্তিক সফলতার পরিবর্তে গুণগত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার। শুধু পাসের হার বাড়িয়ে নয়, শেখার মান বাড়িয়ে শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণমাধ্যম একসঙ্গে কাজ করবে।

যদি এখনই শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার আনা যায়, তবে আগামী প্রজন্মের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় তখন হবে এক সত্যিকারের ‘ল্যাবরেটরি অব লার্নিং’, যেখানে জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবন মিলবে একবিন্দুতে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিনোমিক্স, খাদ্যপ্রযুক্তি, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি ও নৈতিক নেতৃত্ব—এসব হবে শিক্ষার মূলধারা। শেখার কেন্দ্রে থাকবে ‘আজীবন শিক্ষা’ আর শিক্ষকেরা হবেন শুধু পাঠদানকারী নয়; গাইড, কোচ ও সহযাত্রী। পাঠদান হবে স্মার্ট ক্লাসরুম, বাস্তব প্রকল্প ও গবেষণাভিত্তিক, যাতে শিক্ষার্থী শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্য শেখে।

এইচএসসির ফল বিপর্যয় তাই আমাদের ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি নয়; বরং এক জাগরণের আহ্বান। এটি মনে করিয়ে দিচ্ছে, এখনই যদি শিক্ষানীতিতে মৌলিক পরিবর্তন না আনা যায়, তবে এই ফলাফল কেবল শুরু; আগামী দিনে

এর প্রভাব আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। স্মরণ রাখা দরকার—শিক্ষা কোনো পরীক্ষার নাম নয়; এটি একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রক্রিয়া।

পরিশেষে প্রাচীন প্রবাদে যেমন বলা হয়, ‘যে বীজ বপন করো, ফলও তেমনই পাবে।’ আজ আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার বীজ বপন করছি, তার ফলই পাবে আগামী প্রজন্ম। এখনই যদি আমরা শিক্ষাকে মুখস্থের খোলস থেকে মুক্ত করে চিন্তা, সৃজনশীলতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করি, তবে আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে কেবল ডিগ্রিধারী মানুষের দেশ—দক্ষতার নয়, জ্ঞানের নয়; কিন্তু যদি আমরা আজই পরিবর্তনের পথে হাঁটি, তবে শিক্ষাই হবে জাতীয় পুনর্জাগরণের শক্তি—একটি উন্নত, মানবিক ও আলোকিত বাংলাদেশের ভিত্তি।

- • **ড. এ কে এম হুমায়ুন কবির** অধ্যাপক ও গবেষক, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। akmhumayun@cvasu.ac.bd

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো